# শিক্ষার ক্ষেত্রে চাই স্থায়ী পরিকল্পনা

তারিখ 28 APR 1993
দৈনিক বাংলা

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে সম্ভবত সবচেয়ে বেশী পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে রোড ডিভাইডার আর শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে। কখনও রোড ডিভাইডার হিসাবে উঠেছে কংক্রিটের আইল্যান্ড, কখনও তা ভেঙে দেওয়া হয়েছে লোহার রেলিং, কখনও আবার রেলিং ভেঙে পুনরায় আইল্যান্ড। কখনও এসব আইল্যান্ড হয়েছে উঁচু, লোহার ফেন্সিং দিয়ে আলাদা করা হয়েছে আসা-যাওয়ার পথ, কখনও আবার শুধুই ফুটখানেক উঁচু কংক্রিটের ডিভাইডার। এসব ডিভাইডারে কখনও লাগানো হয়েছে ফুলের চারা, অযত্নে অবহেলায় যা মলিন হয়ে গেছে। কখনও একেবারে ঢালাই। এতে রাস্তাঘাটের কি হয়েছে বলতে পারি না, কিন্তু সরকারের যে কোটি কোটি টাকা গচ্চা গেছে, তাতে কোন সংশয় নেই।

প্রায় একই অবস্থা দাঁড়িয়েছে দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে। এ নিয়েও নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালু আছে। কখনও প্রথম সার্টিফিকেট পরীক্ষা নির্ধারণের চেষ্টা হয়েছে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত, কখনও দ্বাদশ শ্রেণী। কখনও এসএসসিতে শুধু রচনামূলক পরীক্ষা, কখনও নৈর্ব্যক্তিক। কখনও উচ্চ শ্রেণীতে ইংরেজী তুলে দেওয়া, কখনও আবার তা বহাল করা। এমনি একটা পরিস্থিতিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রী-অভিভাবকরা পড়ছেন দিকনির্দেশনাহীনতার মধ্যে।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই পরীক্ষানিরীক্ষার অবসান হওয়া প্রয়োজন আছে। এজন্য দরকার স্থায়ী পরিকল্পনা। কিন্তু এ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে গৃহীত ব্যবস্থাবলী পর্যালোচনার দাবী রাখে।

প্রথমে এসএসসি পরীক্ষা সম্পর্কেই বলা যায়। মাত্র কয়েক বছর আগে এসএসসি পরীক্ষার সনাতন পদ্ধতি তুলে দিয়ে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি চালু করা হয়। প্রথম দিকে কথা ছিল এই পরীক্ষায় ৫০ নম্বর থাকবে নৈর্ব্যক্তিকধর্মী, অপর পঞ্চাশ নম্বর থাকবে রচনামূলক। আর উভয় পক্ষে আলাদাভাবে পাস নম্বর পেতে হবে। কিন্তু এতেও বিপত্তি বাধল। এক শ্রেণীর শিক্ষক কোমলমতি ছাত্রদের রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে গাড়ি ভাঙচুর করিয়ে সে ব্যবস্থা রদ করিয়ে নিলেন। তার ফল দাঁড়াল এই যে, শেষ পর্যন্ত নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক পরীক্ষা মিলে ৩৩ শতাংশ নম্বর পেলেই পাসের বন্দোবস্ত হল। আর এর জন্য নির্ধারিত হল পাঁচ শ' প্রশ্নের প্রশ্ন ব্যাংক। কোনমতে ৫০০ প্রশ্ন মুখস্থ রাখতে পারলে এমনকি নৈর্ব্যক্তিক ধারায় ৫০-এ পঞ্চাশ পাওয়াও সম্ভব। ফলে রচনামূলক একটি প্রশ্নেরও জবাব না দিয়ে যে কোন ছাত্রের পক্ষে উচ্চতর দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস করা সম্ভব হল। তাতে দেখা গেল ওই সার্টিফিকেট পরীক্ষায় যেটুকু মেধা অর্জন করা দরকার, তা অর্জন করছে না ছাত্রছাত্রীরা। শিক্ষার মান পড়ে যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পুনরায় পরিবর্তন আনতে হচ্ছে। ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক উভয় পরীক্ষায় আলাদা আলাদাভাবে পাস করতে হবে। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তরে যে যাই পাক না কেন, রচনামূলক পরীক্ষায়ও তাকে পাস নম্বর অর্জন করতে হবে। তাছাড়া ওই পরীক্ষায় প্রশ্ন ব্যাংক ব্যবস্থাও সংশোধিত হবে।

এসএসসি পরীক্ষায় বর্তমান পদ্ধতিতে শিক্ষার মান পড়ে যাচ্ছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন শিক্ষক-অভিভাবকরা। সে সত্যও অস্বীকার করা যায় না। কারণ কেবল কিছু প্রশ্নের জবাব মুখস্থ করার সঙ্গে প্রকৃত শিক্ষার সম্পর্ক নেই। শিক্ষার্থীর পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে অনুধাবন করা ও নিজের মতো করে প্রকাশ করার ক্ষমতা অর্জনও শিক্ষার সঙ্গে জড়িত। সে কারণেই আমরা মনে করি, এই ব্যবস্থায় অগ্রসর হওয়া যায়।

তবে এই সকল ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশী জরুরী শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ। প্রকৃত শিক্ষা কেবলমাত্র পরীক্ষা-পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে শিক্ষাদানে নিষ্ঠার ওপরও। দেশের বহু স্কুলে উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষক ও আনুষঙ্গিক উপকরণেরও অভাব রয়েছে। ফলে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না, ছাত্রছাত্রীরা প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে না। শিক্ষার্থীরা এতসব সত্ত্বেও পরীক্ষায় দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। এবারও এসএসসি পরীক্ষায় হাজার হাজার ছাত্র নকলের দায়ে, দুর্নীতির দায়ে বহিষ্কৃত হচ্ছে। এখনও তো পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক মিলে মোট ৩৩ পেলেই পাস করা যায়। তা সত্ত্বেও কেন নকলের আশ্রয় নিচ্ছে তারা? কেনই বা এই নকল-দুর্নীতিতে সহায়তা করছেন শিক্ষকরা? এর কারণও শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষা পরিবেশের অভাব। সরকার যদিও ঘোষণা করেছেন যে, এবার পরীক্ষায় যেসব স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা নকল-দুর্নীতির আশ্রয় নেবে, সে সব স্কুলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু সেই কঠোর ব্যবস্থা নিয়েও যে পরীক্ষায় নকল-দুর্নীতি বন্ধ করা যাবে তাও মনে হয় না। আসলে শিক্ষাঙ্গনে যদি ছাত্র-ছাত্রীরা প্রকৃত শিক্ষা পায়, যদি তাদের সত্যিকার অর্থেই লেখাপড়া শেখানো যায়, যদি সেখানে পাঠ অনুশীলন হয় যথাযথভাবে তবেই পরীক্ষায় দুর্নীতির অবসান ঘটানো সম্ভব, বাড়ানো সম্ভব শিক্ষার মান।

একই ধরনের অবস্থা ইংরেজী শিক্ষা নিয়েও। প্রাথমিক স্তর থেকেই দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজী ভাষার প্রচলন রয়েছে। ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল একেবারে সর্বোচ্চ স্তরের শিক্ষা পর্যন্ত। কিন্তু বিপত্তি বাধল এসে স্নাতক শ্রেণীতে। দেখা গেল স্নাতক শ্রেণীতে বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রী ইংরেজী বিষয়ে ফেল করছে। তাতে পাসের হার দাঁড়াত শতকরা দশ/এগারো ভাগ। এই অবস্থায় স্নাতক পর্যায়ে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে এক ধরনের অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ফলে বেশ কয়েক বছর আগে স্নাতক শ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলক ইংরেজী তুলে দেওয়া হয়। তাতে পাসের হার বেড়ে ৪০/৫০ শতাংশে দাঁড়ায়।

কিন্তু বিপত্তি বাধল ফের। দেখা গেল ইংরেজীর ওপর উপযুক্ত গুরুত্ব না দেওয়া স্নাতক-উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজী ভাষায় কোন রকম যোগাযোগই করতে পারছে না, লিখতে পারছে না একটি চিঠিও। কিংবা জবাব দিতে পারছে না কোন চিঠিপত্রের। এর ফলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও দুর্বলতার সৃষ্টি হচ্ছে বলে অভিযোগ।

সে অবস্থা নিরসনের জন্য পুনরায় স্নাতক পর্যায়ে ইংরেজী বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ পেশ করা হয়েছে। এর পক্ষে যুক্তি—যারা স্নাতক পাস করবেন, তাদের অন্তত একটি আন্তর্জাতিক ভাষায় দক্ষ হতে হবে। তাদের উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে, আন্তর্জাতিক কর্মী হিসাবে। এ যুক্তি নিতান্ত ফেলনা নয়। এর বিরুদ্ধে যারা তাদের যুক্তি—ইংরেজী বাধ্যতামূলক করলে পুনরায় স্নাতক পর্যায়ে পাসের হার পড়ে যাবে এবং অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি হবে শিক্ষাঙ্গনে। তাছাড়া স্নাতক পর্যায়ে তো অপশনাল বিষয় হিসাবে ইংরেজী রয়েছেই। যারা ইংরেজীতে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে চান, তারা পড়ুন না কেন ইংরেজী, কেউ তো বাধা দিচ্ছে না। আর স্নাতক পাস সকলেই তো সরকারের গেজেটেড অফিসার হচ্ছে না। যারা তা হতে চান তারা পড়ুন ইংরেজী। উভয় পক্ষের যুক্তিই বিবেচনাযোগ্য। এসব যুক্তি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষা-ব্যবস্থার দিকেও দৃষ্টিপাত করা যায়। পৃথিবীর প্রায় সকল উন্নত দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় সেকেন্ডারী পর্যায়ে একটি দ্বিতীয় ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে হয়, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অন্তত দুটি বিদেশী ভাষা রফত করা বাধ্যতামূলক। সেভাবেই অতি দ্রুত সেসব দেশ পৃথিবীর অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে, প্রযুক্তিগত উন্নতির সঙ্গে দ্রুত পরিচিত হচ্ছে, আমরা থেকে যাচ্ছি অন্ধকারেই।

তাছাড়াও ইংরেজীর পক্ষে যুক্তি হচ্ছে উচ্চতর শ্রেণীতে বাংলায় পাঠ্য পুস্তকের অভাব। এতে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীকে ইংরেজীতে পড়াশোনা করতেই হয়। কিন্তু তাদের ভিত্তি যদি দৃঢ় না হয়, সে ক্ষেত্রেও প্রকৃত জ্ঞানার্জন বাধাগ্রস্ত হবে। এই বাস্তবতা সামনে রেখেই স্নাতক পর্যায়ে ইংরেজী বাধ্যতামূলক করার বিষয় চিন্তা করা দরকার। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার, সর্বস্তরে বাংলা প্রচলন, সম্পূর্ণরূপে বাংলায় লেখাপড়ার জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নও জরুরী। উন্নয়নশীল অনেক দেশেই এখন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের জন্য কমপক্ষে একটি বই বিদেশী ভাষা থেকে নিজস্ব ভাষায় অনুবাদ করতে হয়।

তেমনি দরকার পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা। আজ যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে, তা যেন আগামী ২০ বছরেও আমূল পরিবর্তন করতে না হয়। একথা সত্যি যে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন আনতে হতে পারে। কিন্তু মূল কাঠামোতে যেন পরিবর্তন আনতে না হয়। আর একই সঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী যেন শিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তোলা যায়, তারও পরিকল্পনা দরকার। আগামী দশ বছরে উন্নয়নের গতিধারায় আমাদের কতসংখ্যক কারিগর, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, কূটনীতিক, বিশেষজ্ঞ দরকার তা নিরূপণেরও প্রয়োজন আছে। তা নির্ধারণ করতে পারলে এসএসসি বা স্নাতক পর্যায়ে পরীক্ষার ক্ষেত্রে এত নিরীক্ষার প্রয়োজন হবে না। আমরা চাই দেশে দ্রুত শিক্ষার বিস্তার ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার একটি সুনির্দিষ্ট স্থায়ী পরিকল্পনা নেওয়া হোক।

— রেজোয়ান সিদ্দিকী

৩৮

২